ওসামার সাথে আমার জীবন

নাসের আল-বাহরি
(বিন লাদেনের সাবেক দেহরক্ষী)

সহলেখক
জর্জেস ম্যালব্রুনো

ভাষান্তর
ইউসুফ তাসফিন

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

ওসামার সাথে আমার জীবন

প্রকাশকাল: আগষ্ট ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Osamar Sathe Amar Jibon by Nasser al-Bahri
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95578-5-2

"একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে জীবনযাপনের এক প্রত্যক্ষ ও অসাধারণ বর্ণনা।"

-Le Figaro Magazine, ৯ এপ্রিল, ২০১০।

"বিন লাদেনের সাবেক দেহরক্ষীর বর্ণনা রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর।"

-Tele et Vous, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

"বাহরির কথাগুলো যেন তথ্যের খনি।"

-Liberation, ১৯ এপ্রিল, ২০১০।

"আল-কায়েদার অভ্যন্তরে জীবন কাটানোর একেবারে যথার্থ ও সরাসরি দলিল। ...বাহরি আমেরিকা, কানাডার প্রকাশকদের কাছে তার গল্প বিক্রি করতে চাননি। সানাআয় তিনি ম্যালব্রুনোকে বলতে রাজি হয়েছেন।"

-Le Monde, ২৪ এপ্রিল ২০১০।

"অসাধারণ গল্প...বাহরি পাকিস্তানের একটি ঘরে বসে ৯/১১ দেখাকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।"

-El Pais, ২ মে, ২০১০।

"আল-কায়েদা নেতার আঁচল থেকে পাওয়া গল্প।"

-Sunday Times, ১৯ এপ্রিল, ২০১০।

"সে আমাদের আল-কায়েদা সম্পর্কে রীতিমতো তথ্যের খনি দিয়েছে।"

-আলি সুফান, তিনি সেই এফবিআই গোয়েন্দা,
যিনি বাহরিকে বেশ কয়েক সপ্তাহ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

"বাহরি যেকোনো বন্দির চেয়ে বেশি জরুরি। অথচ আর সব বন্দিকেই বিন লাদেনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকার কারণে গুয়ান্তানামোতে পাঠিয়ে দিই।"

-মাইকেল শইয়ার, আলেক স্টেশনের সাবেক হেড।
সিআইএ'র এই ইউনিটটিই বিন লাদেনকে খুঁজে বের করেছিল।

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ৭
"নাও, আমাকে হত্যার বন্দুক!"..... ৮
প্রথম অধ্যায় : জিহাদের পথে..... ১১
বাবার সাথে দ্বন্দ্ব..... ১১
আফগান জিহাদের বার্তা (১৯৭৯-১৯৮৯)..... ১৪
সৌদি সরকারের প্রতি বিন লাদেন ও আলেমদের চ্যালেঞ্জ..... ১৬
আমার গোপন রাজনৈতিক কার্যক্রম..... ২০
দ্বিতীয় অধ্যায় : বসনিয়া, আমার প্রথম জিহাদ..... ২৩
তৃতীয় অধ্যায় : বসনিয়ায় আমার জিহাদ..... ৩১
চতুর্থ অধ্যায় : সোমালিয়ায় টাকার জিহাদ..... ৩৭
পঞ্চম অধ্যায় : তাজিকিস্তান অভিমুখে..... ৪২
ষষ্ঠ অধ্যায় : বিন লাদেনের সাক্ষাতে..... ৪৭
সপ্তম অধ্যায় : দেহরক্ষী হওয়ার প্রস্তুতি..... ৫৪
অষ্টম অধ্যায় : ওসামা বিন লাদেনের সাথে প্রাত্যহিক জীবন..... ৬৪
নবম অধ্যায় : আল-কায়েদা হেডকোয়ার্টারে জীবন..... ৭১
বিন লাদেনের দৈনিক রুটিন..... ৭১
বিন লাদেনের নিরাপত্তা..... ৭৩
আল-কায়েদা যেভাবে কাজ করে (প্রশাসন)..... ৭৬
বিন লাদেনের অফিস ও আল-কায়েদার গণমাধ্যম বিভাগ..... ৮০
আল-কায়েদা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ..... ৮৩
আল-কায়েদার 'মূল হোতারা'..... ৮৫
সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা..... ৯১
আল-কায়েদার যুদ্ধাস্ত্র..... ৯৪
দশম অধ্যায় : ১৯৯৮-এর গ্রীষ্ম, প্রথম হামলা..... ১০১
একাদশ অধ্যায়: গুপ্তচর শিকারের ভরা মৌসুম..... ১০৯
বিন লাদেনকে হত্যাচেষ্টা..... ১১৬
দ্বাদশ অধ্যায় : কান্দাহারে কাঙ্গাল আল-কায়েদা..... ১১৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিন লাদেন ও তালেবান ১২২
চতুর্দশ অধ্যায় : ইয়েমেনে ফেরার যাত্রা ১২৯
পঞ্চদশ অধ্যায় : বিন লাদেনের স্ত্রী এবং সন্তানাদি ১৩৫
তার সন্তানাদি ১৩৫
তার স্ত্রীগণ ১৩৭
তার সন্তানদের শিক্ষা ১৪০
ষোড়শ অধ্যায় : এক মিশনে আমার সোমালিয়া গমন ১৪৪
বিন লাদেনের সাথে বিচ্ছেদ ১৪৮
সপ্তদশ অধ্যায় : কারাগার এবং অপরাধবোধ ১৫৪
কারাগারে ১৫৭
অষ্টাদশ অধ্যায় : ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ ..... ১৬০
৯/১১ হামলাকারীরা আমার চেনা ১৬৫
অনুশোচনার পানে ১৬৮
এক কঠিন পুনর্বাসন ১৭০
ঊনবিংশ অধ্যায় : ইরাক ১৭৬
বিংশ অধ্যায়: আল-কায়েদার অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ১৮৩
একবিংশ অধ্যায় : আল-কায়েদার কেন্দ্র আর নেই ১৯৪

ভূমিকা

২০১০ সালে ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক জর্জেস ম্যালব্রুনো[১] ওসামা বিন লাদেনের সাবেক দেহরক্ষী নাসের আল-বাহরির গল্প জানতে চাচ্ছিলেন। তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তার মূল আগ্রহের জায়গা ছিল তারনাক ফার্মে আফগান হেডকোয়ার্টার।

আল-বাহরিই একমাত্র সাবেক আল-কায়েদা সদস্য, যিনি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন। আল-বাহরি ২০০১ সালে গ্রেফতার হন। তাকে সানাআ জেলে আটক রাখা হয়। ইয়েমেন সরকার তাকে দুই বছর পর ছেড়ে দেয়। তারা কারণ হিসেবে দেখায় যে, আল-বাহরি 'তাওবা' করেছেন। ৭০টি রাষ্ট্র এখনো তাকে গ্রেফতার করতে মরিয়া।

তারনাক ফার্মে জীবন, আল-কায়েদার নেতা, তাদের পরিবারের অবস্থা ও সম্পর্ক, সংগঠনটির কাঠামো, আল-কায়েদা ও তালেবানের মধ্যকার সম্পর্ক, পাকিস্তান আর্মি ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থার কাজ, ওসামা বিন লাদেনের জীবন, ৯/১১ পরিকল্পনা—এসব বিষয়গুলো খুবই নাটকীয়ভাবে তুলে এনেছেন আল-বাহরি।

আল-বাহরি কীভাবে আল-কায়েদায় যোগ দিয়েছেন তা থেকে আমরা তরুণ জিহাদিদের সাইকোলজিও বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, কেন তারা স্বাভাবিক, সম্ভাবনাময় জীবন বাদ দিয়ে 'শহিদ' হওয়ার পথে চলে যায়।

আল-বাহরি এখন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। তিনি নিজেকে 'ইতিহাসের সাক্ষী' বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে, তার গল্প অনেককেই এ পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।

এফবিআই আল-বাহরির সাক্ষ্যকে 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের খনি' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ বইয়ে যা আছে এগুলো সবই তার একান্ত আবেগ ও পর্যবেক্ষণ থেকে বলা।

---

১. জর্জেস ম্যালব্রুনো *Le Figaro*-এর একজন চিফ রিপোর্টার এবং মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষক। ইসলামিক স্টেট অব ইরাক তাকে ২০০৪ সালে ১২৪ দিন বন্দী করে রেখেছিল।

"নাও, আমাকে হত্যার বন্দুক!"

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে আয়মান আল-জাওয়াহিরি ও আবু হাফস আল-মাসরি কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন মাগরিবের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে। শায়খ ওসামা বিন লাদেন তখন তার কাবুল অফিসে একা একা বসে ছিলেন। ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দারুস সালামে আমেরিকার দূতাবাসে হামলার পর আল-কায়েদার নেতারা সেখানে চলে যান। তিনি আমাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ডাকলেন এবং মুচকি হেসে বললেন, "আবু জান্দাল, এদিকে এসো। আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি।"

আমি তার কাছে গেলাম। তিনি তার সাওব (জুব্বার ওপর যে পোশাক পরা হয়) থেকে একটি হ্যান্ডগান বের করলেন।

"আল্লাহ না করুন, যদি শত্রুরা আমাদের এমনভাবে ফাঁদে ফেলে কিংবা ঘিরে ফেলে যে আমরা গ্রেফতার হই, তবে তুমি আমাকে মাথায় দুইবার গুলি করবে। আমি গ্রেফতার হওয়ার আগে মরে যাচ্ছি। আমি আমেরিকানদের হাতে কখনোই জীবিত ধরা দিচ্ছি না। আমি শহিদ হতে চাই। কখনোই জেলে যেতে চাই না।"

"ও শায়খ! আল্লাহ কখনোই যেন এমন অবস্থা না করেন যে আমার হাতে আপনাকে মারা যেতে হয়। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।"

তারপর শায়খ ওসামা আমার হাতে দুটো বুলেট দিয়ে বললেন, "আজ থেকে এটাই তোমার মিশন। যা বলেছিলাম, এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে অবশ্যই আমাকে হত্যা করবে।"

আমি চলে আসার সময় আমার বুকে পাহাড় সমান দ্বিধা অনুভব করলাম। গ্রেফতার হওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য হত্যা করার পরিস্থিতিটা হয়তো খুবই জঘন্য হবে অথবা হয়তো পরিস্থিতির ভয়াবহতা মাপার দায়িত্ব তিনি আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা, তিনি আমাকে এ কথাগুলো ছাড়া আর কিছুই বলেননি। এই ঘটনার পর থেকে অ্যালার্ম বাজলেই আমার বুক ধুকপুক শুরু করত। প্রতিমাসেই বেশ কয়েকবার এমন হতো।

কিছু দিন পরেই আমি আমার পুরোনো বন্দুক (এ ধরনের বন্দুক শায়খের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সব সদস্য ব্যবহার করে) আমার এক সহকর্মীকে দিয়ে দিই। তারপর থেকে আমি শায়খের দেওয়া বন্দুক ব্যবহার করা শুরু করি। আমি

সবখানেই এটা ও একটা কালাশনিকভ নিয়ে যেতাম। আমি এ বন্দুকটার নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করতাম যে আমি এটা কাউকে কখনো রাখতেও দিইনি। আমি প্রতিদিন শায়খের দেওয়া সে দুটো বুলেট চেক করতাম। প্রতিদিন বন্দুকটি মোছার সময় আল্লাহকে বলতাম, "আল্লাহ! আমাকে কোনোদিন যেন এ কাজ করতে না হয়।"

একমাত্র আমিই সেই মোস্ট ওয়ান্টেড মানুষটিকে কোনো বাঁধা ছাড়াই হত্যা করতে পারি যার মাথার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিছুদিন পরেই আমি শায়খের হাতে বাইয়াত দিতে গেলাম। শায়খ অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আবু জান্দাল, এটার তো দরকার নেই এখন।"

পার্থিব দৃষ্টিতে তার জীবন আমার হাতে ছিল। ঠিক এ কারণেই আমি অনেক বেশি ও গভীরভাবে আমার দায়িত্ব নিয়ে ভাবতাম। তার ওপর শায়খ সবসময় বলতেন, "আবু জান্দালের কণ্ঠ না শুনলে আমার নিজেকে নিরাপদ মনে হয় না।"

কয়েক মাসে আগে অতি উৎসাহী এক জিহাদির হাত থেকে শায়খকে রক্ষা করে আমি আলাদা সম্মান অর্জন করি। তার নাম ছিল আবু আশাথা। সে ছিল সুদানী তাকফিরি। সে ১৯৮০'র দশকে আফগান মুজাহিদিনদের সাথে জিহাদে অংশ নিয়েছিল। এখন সে আফগানিস্তানে ফিরে এসেছে। সবাই তার কর্কশ ব্যবহার সম্পর্কে জানত। কম ধার্মিক এমন যে কারো সাথেই সে দুর্ব্যবহার করত। একদিন সে শায়খ ওসামার সাথে দেখা করতে আসে। আমি শায়খের নিরাপত্তাহীন অবস্থায় এমন মুখোমুখি আলোচনা পছন্দ করিনি। আমি শায়খকে বললাম, "শায়খ, আমি আপনার পেছনে থাকি?"

শায়খ বললেন, "না। বাইরে অপেক্ষা করো।"

আমি বাইরে থাকলেও কি-হোল দিয়ে আলোচনার দিকে খেয়াল রাখছিলাম। ওসামা তাকে বিশ্বাস করেননি। হয়তো তাই তিনি তার হাত বন্দুকের ওপর রেখেছিলেন। একসময় আবু আশাথা চিৎকার করে, হাত নাড়িয়ে কথা বলতে থাকে। আমার একসময় মনে হলো, সে হয়তো শায়খের দাঁড়ি ধরে বসবে। আমি দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। আমার হাঁটু দিয়ে তার পেট চেপে ধরলাম।

শায়খ বলে উঠলেন, "এ কি! কী করছ তুমি? তুমি তো তাকে মেরেই ফেলবে! ছাড়ো এক্ষুণি।" পরবর্তী সময়ে আমার এ কাজের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে শায়খ তাকে বেশ কিছু ডলার দিলেন।

দশ বছর আগে জেদ্দায় আমি দীনের দাওয়াত পাই। তখন থেকেই আমি জিহাদে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমার স্বপ্ন সত্যিও হয়েছিল কিন্তু আমি কখনোই ভাবিনি যে আমি একদিন বিন লাদেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হয়ে উঠছি।

প্রথম অধ্যায় : জিহাদের পথে

বাবার সাথে দ্বন্দ্ব

১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় রেড সী পোর্টে আমার জন্ম। বিন লাদেন পরিবার ও এমন অসংখ্য পরিবারের মতো আমার বাবা আহমদও ষাটের দশকে তার পরিবার নিয়ে ইয়েমেন থেকে চলে আসেন।

আমার বাবা শাবওয়া থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। গ্রেফতার এড়াতে তিনি প্রথমে উত্তর ইয়েমেন পালিয়ে যান। তিনি ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদী। স্বাভাবিকভাবে এ কারণেই তিনি জামাল আবদুল নাসেরকে অনেক সম্মান করতেন। এমনকি নিজের চুলও জামালের মতো করে আঁচড়াতেন। আমার মা ছিলেন আমার বাবার কাজিন। এমন বিয়ে করা ছিল আমাদের ঐতিহ্য। আমার মায়েদের পরিবার ছিল শেখ। তাদের গোত্র ছিল ঐতিহ্যবাহী যোদ্ধা গোত্র। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

সেসময় ইয়েমেনি সমাজের অনেক অংশ ছিল। একটা অংশ ছিল সাইয়েদ-তারা ছিল সমাজের নেতা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ। আরও ছিল কাবিলি—এরা ছিল যোদ্ধা। ফেলাহিনরা ছিল কৃষক ও আখদামরা ছিল চাকর।

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার বাবা ব্রিটিশদের মেকানিক ছিলেন, পরে তিনি এক ড্যানিশ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। সবশেষে তিনি আরবের সেরা কন্সট্রাকশন কোম্পানি 'বিন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি'তে কাজ শুরু করেন। আমার মা একজন গৃহিনী এবং দশ সন্তানের জননী। আমি ছিলাম জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাই ছোটবেলা থেকেই মা এবং অন্য ভাইবোনদের দেখাশোনা করতে হতো আমাকে। আমার যৌবনে বাবা আমাকে বললেন, "তুমি আমার ছেলে বটে, কিন্তু নিজের দায়িত্ব নিজের কাছে।"

আমাদের দিন ভালোই যাচ্ছিল। বাবা ও চাচার কিছু জমি ছিল। দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়োতে তাদের কিছু বিনিয়োগও ছিল। বিশের দশকে আমার দাদা সেখানে যান। সম্পত্তিগুলো আসলে তারই।

আমার বাবা ইউরোপে ছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু সালাত ছেড়ে দেওয়া সহ্য করা যায় না!"

তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। আমি তাকে ফজরের আগে জায়নামাজ নিয়ে হাঁটতে দেখতাম। তাকে দেখতে মোটেই ধার্মিক মনে হতো না। তার দাঁড়ি ছিল না, তিনি পাগড়ি-থাওব পছন্দ করতেন না। আমি দশ বছর বয়স থেকেই সালাত আদায় করতাম। আমার পক্ষে কোনোভাবেই সালাত ছাড়া সম্ভব ছিল না। স্কুলে সব ছেলেকেই সালাত আদায় করতে হতো। সালাতের সময় সকল দোকান বন্ধ হয়ে যায়, সব গুরুজনরা সালাত পড়তে বলেন।

আমার দেখা প্রথম রাজনৈতিক উত্থান এখনও আমার মনে আছে। সেটা ছিল ১৯৭৯ সালের মক্কার দাঙা। রামাদানের কিছুদিন আগে এ উত্থান হয়। তখন স্কুলের ছুটি চলছিল। আমরা খেলছিলাম, এমন সময় ন্যাশনাল গার্ডের কিছু গাড়ি আসে। স্কুলে আমাদের শিক্ষকরা বলেন, "বিদ্রোহীরা আসলে পথভ্রষ্ট ছিল।" এটার ব্যাপারে আমার বাবার দুই ধরনের মত ছিল। একদিকে তিনি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-কাহতানি ও জুহাইমান আল-উতাইবিকে সমর্থন করেন, কেননা আরব সরকার আরব জাতীয়তাবাদের ক্ষতি করেছে এবং ব্যাপক দূর্নীতিগ্রস্থ ছিল। আবার তিনি মক্কার মতো পবিত্র স্থানে এ ধরনের সংঘর্ষ সমর্থন করেননি। মক্কা রক্তপাতের জায়গা না।

বাবা সাধারণ মানুষের প্রতি ইসলামি মৌলবাদীদের অবস্থানের বিরোধী ছিলেন। তারা রাস্তায় মানুষকে মেরেধরে মসজিদে পাঠাত, জোর করে দোকান বন্ধ করে দিত। বাবার মনে হতো, মৌলবাদীরা ইসলামের নাম খারাপ করছে। তিনি সৌদি সরকারকে অসম্ভব ঘৃণা করতেন। কারণ, এরা নিজেদেরকেই একমাত্র মুমিন ভাবে, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত জীবন মোটেই মুসলিমের মতো না। তিনি কেবল কিং ফয়সালকেই পছন্দ করতেন।

সৌদি আলেমরা যখন ষাটের দশকে নাসেরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তখন তিনি তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে যান। মুসলিম ব্রাদারহুডবিরোধী অনেক আরব জাতীয়তাবাদী বাবার বন্ধু ছিল।

আমি আর বাবা সারাক্ষণ রাজনীতি ও ধর্ম নিয়েই মেতে থাকতাম। আমাদের সিক্সথ গ্রেডের বইতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে ও সাউদ বংশের যে সাম্রাজ্য, তার প্রশংসা করা হয়েছে। তারা আরব জাতীয়তাবাদীদের প্রচুর সমালোচনা করেছে, বলেছে—তারা নাকি 'মাদকাসক্ত'।

আমার বাবা, যিনি কিনা জীবনে এক ফোঁটা অ্যালকোহলও খাননি এবং আমার মা বাদে অন্য কোনো নারীকে কামনা করেননি, তিনি আমাকে সবকিছু নিয়ে নতুন করে ভাবতে বললেন। স্কুলে-মসজিদে যা বলে, তাই শেষ কথা নয়।

"জীবন সম্পর্কে কী জানো তুমি? কিছুই না। সৌদি রাজপরিবারের বাচ্চারা ঐক্য ও আরব জাতীয়তাবাদ নিয়ে কী জানে? আমরা যুদ্ধ দেখেছি, ওরা দেখেনি।"

তিনি পুরোপুরি ভুল বলেননি। তার সাথে আমার সম্পর্ক ধীরে ধীরে সমস্যা ও শ্রদ্ধার এক মিশ্র, মধুর সম্পর্ক হয়ে উঠতে থাকে। আমি তার কঠিন ব্যক্তিত্ব পছন্দ করতাম, কিন্তু একই সাথে তার কঠিন শাস্তিকে ভয়ও পেতাম। তার সাথে চলতে হলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে।

স্কুলে আমি ভালো ছাত্র ছিলাম। জেদ্দা থেকে স্নাতক শেষে এক প্রাইভেট কলেজ থেকে এডমিনিস্ট্রেশনের ওপর ডিপ্লোমা করি। সেসময় বিদেশিরা সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারত না। আশির দশকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কম ছিল। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই ধর্মীয় রীতি মেনেই চলত। সবখানেই কুরআন শেখানো হতো। কিছু কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান কিছুটা ভালো ছিল।

আমি ১৯৯০-এ স্নাতক শেষ করি, কিন্তু সৌদিরা আমাকে ডিপ্লোমা দিতে চাচ্ছিল না। কারণ, সৌদিতে আমার থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। সেসময় আমার বাবা ব্যবসার কাজে সোমালিয়ায় ছিলেন।

১৯৯০ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর ছিল। সে বছর উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন এক হয়, সাদ্দাম কুয়েত দখল করে, গাল্ফ যুদ্ধ শুরু হয়। এসব ঘটনার কারণে আমাদের ওপর চাপ বাড়তে থাকে।

অনেক ইয়েমেনি পরিবার পালিয়ে যায়। কিছু প্রতিবেশি ও আমার পরিবারকে দুই বছর লুকিয়ে থাকতে হয়। আমাদের হাতে কোনো কাজ ছিল না, থাকার অনুমতি ছিল না। খুব কঠিন একটা সময় ছিল সেটা আমাদের জন্য। শুধু আমার মা-ই ঘর থেকে বেরোতে পারতেন। কারণ, তিনি নারী। কেউ তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করত না। মসজিদে যাওয়া বাদে প্রায় পুরোটা সময় আমরা ঘরেই থাকতাম। ইরাকিরা কুয়েত থেকে চলে যাওয়ার পর আমার বাবা ফিরে আসেন সোমালিয়া থেকে। তিনি আসার পর এসব সমস্যা সমাধান হয়। এসব ঘটনার পর আমি সৌদিদের অপছন্দ করা শুরু করি। আমার মনে হতে থাকে, তারা সৎ না। কেবল আলেম ও দাতাসংস্থাগুলোই আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

তার কাছের একজনকে ঘুষ দিয়ে আমি একটি আইডি কার্ড যোগাড় করতে পারলাম। আমাদের সাহায্য করেছেন কিং আবদুল্লাহর ভাইয়ের ছেলে ও আফগানিস্তানে জিহাদ করা মুজাহিদ নায়েফ বিন মাহমুদ বিন আবদুল আজিজ। এর মানে ছিল আমরা মুক্তভাবে চলতে পারছি। কিন্তু আমরা কখনোই আগের মতো অধিকার পাচ্ছি না। অথচ এ দেশই কিনা একসময় আমাদের স্বাগত জানিয়েছিল, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। সেদিন থেকে সৌদির প্রতি আমার সম্মান অনেকাংশেই চলে গিয়েছিল।

আফগান জিহাদের বার্তা (১৯৭৯-১৯৮৯)

১৬ বছর বয়সে পৌঁছেই আমি দীনের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে যাই। শাহাদাতের চিন্তায় আমি মরিয়া। আমি আমার বন্ধুদেরকেও বলতাম, "আমাকে শহিদ হতেই হবে।" যারা মুসলিমদের ও ইসলামের ভূমি দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে নামতে চাইলাম আমি। আমার কাছে জিহাদ ছিল সালাত-সিয়ামের মতোই একটা স্তম্ভ।

বলাই বাহুল্য, এ পর্যায়ে আমি আফগানিস্তান ছাড়া আর কোনো পথ দেখলাম না। সেসময় সৌদি সরকারও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যুবকদের সোভিয়েতবিরোধী জিহাদে অংশ নিতে উৎসাহ দিত। স্কুল-কলেজ, মার্কেট ও মসজিদে জিহাদের জন্য চাঁদা তোলা হতো। মসজিদে মসজিদে জিহাদে জয়ের জন্য দোয়া করা হতো। বড়লোক ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তি, যুবরাজ, দাতাসংস্থা প্রত্যেকেই সাহায্য করেছে। বসনিয়ার মুসলিমদের সময় সাহায্য আরও বেড়ে যায়। আমার কোয়ার্টারের অর্ধেক ছেলেই আফগানিস্তান চলে যায়। আমি আমার প্রতিবেশীদের বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে যাই। আমি তাদের বিদায় দিয়ে বাসায় এসে বসে বসে কাঁদতাম।

মুজাহিদরা যখন ফিরে আসতেন, তাদের বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হতো। সবাই তাদের বিজয়ের গল্প শুনতে চাইত। তারা ছিলেন জাতীয় হিরো। সবাই এমনভাবে তাদের কাছে ঘুরত তারা যেন সাহাবাদের খুঁজে পেয়েছে। এটা একটা জাতীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ফ্লাইট ছিল সৌদি থেকে পেশোয়ারে। সেসব এয়ারলিফটে ৭৫% খরচ কমিয়ে দেওয়া হয়। অনেকসময় বাকি ২৫%ও দাতাসংস্থা দিয়ে দিত। পোষাক পর্যন্ত দাতাসংস্থা দিত। বলা যায়, আফগান জিহাদের সমর্থন ছিল জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক।

আমি তখনই চলে যেতাম, কিন্তু আমার বাবা কোনোভাবেই আমাকে যেতে দেননি। তার জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার কারণে তিনি সোভিয়েতের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি আফগান-আরব মুজাহিদদের সৌদি ইসলামপন্থীদের মতোই দেখতেন। তাদের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। আবার তারা আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছিল, এ কারণে বাবা আরও বিতৃষ্ণ হয়ে যান। আমার সাথে তার অনেক তর্ক হতো। তিনি মেরেধরে আমার মুখ বন্ধ করাতেন। তিনি আমাকে বলতেন মুজাহিদিনরা নাকি আসলে আমেরিকা ও সৌদি গোয়েন্দাসংস্থার পুতুল। আমি ভাবতেই পারি না যে মুজাহিদরা পশ্চিমাদের হাতের পুতুল। আমি আমার পাসপোর্ট নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবার হাতে ধরা পড়ে যাই। বাবা সেদিন আমাকে মারেননি। হয়তো বয়সের কথা ভেবেছেন, আলোচনার কথা ভেবেছেন।

তিনি আমার দিকে আমার পাসপোর্ট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "তোমার জিহাদের উৎসাহ ভালো বিষয়। কিন্তু তুমি আমাকে কেবল একটা প্রশ্নের জবাব দাও, কেন আমাদের নেতারা নিজেরা জিহাদে অংশ নেয় না? কেন ওরা মসজিদে সবাইকে জিহাদে যেতে বলে আর তারপর বাসায় গিয়ে ঘুমায়? যদি এর জবাব দিতে পারো তাহলে যেতে পারবে।" আমার কাছে এর জবাব ছিল না। আমি চুপ করে রইলাম।

যদিও আমেরিকার এ অবস্থানটা আপত্তিকর ছিল তবুও আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক হতো। এটা সত্য যে, আমেরিকা ওসামা বিন লাদেন ও আফগান মুজাহিদিনদের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল। কিন্তু আমি বেশিই অবুঝ ছিলাম।

তারপরে অনেকদিন ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়। তিনি আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছিলেন। ইসলামি পুনর্জাগরণের চিন্তায় বিভোর একদল ছেলেকে নিয়ে কিছু কোর্স পরিচালনা করেন তিনি। আমি এমন দুটো কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম। তখন শায়খের সাথে আমার সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। তিনি আফগান জিহাদের জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এটা সেসময়কার কথা যখন তিনি সৌদি সরকারের সমালোচনা করা শুরু করেননি। আফগানিস্তানের জন্য অর্থ জোগাড় করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য।

আমি এর আগে আবদুল্লাহ আযযামেরও কয়েকটি কোর্সে অংশ নিই। আফগান জিহাদকে ত্বরান্বিত করাই ছিল এগুলোর উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ আযযাম ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি। ওসামা বিন লাদেনের ওপরে তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। তারা দুজন মিলে ১৯৮৪ সালে পেশোয়ারে মাকতাব আল-খিদমাত (সার্ভিস ব্যুরো) প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মূলত সৌদি থেকে আগত মুজাহিদদের অভ্যর্থনা, সহায়তা দেওয়া হতো।